চেরনোবিলের জবানবন্দি

সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ

Voices from Chernobyl বইটি চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র দুর্ঘটনার শিকার পাঁচশ জনেরও বেশি মানুষের অভিজ্ঞতার বয়ান, যাঁদের মধ্যে ছিলেন অগ্নিনির্বাপণকারী, দুর্ঘটনাস্থল নিরাপদকারী দলের সদস্য, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, বিজ্ঞানীসহ নানা পেশার মানুষ। এখানে লেখক ক্ষতিগ্রস্তদের জবানিতে তুলে এনেছেন তাঁদের অতীত স্মৃতি আর চিরস্থায়ী ক্ষতের যন্ত্রণা। সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ তাঁর অন্যান্য ননফিকশন বইয়ের মতো এটিতেও অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে ঘটনার পেছনে ছুটেছেন, কিন্তু মতামত চাপিয়ে দেননি। দুঃসহ স্মৃতির বর্ণনায় একেকটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে পারমাণবিক বিপর্যয়ের নানা দিক, যা বইটি প্রকাশের আগে আমাদের কাছে ছিল অজানা। ১৯৯৭ সালে রুশ ভাষায় প্রকাশিত বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ২০০৫ সালে। এটি ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সোভিয়েত শাসনামল, আফগানিস্তান যুদ্ধ নিয়ে লেখক প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানিতে ভিন্ন ভিন্ন বই লিখেছেন। সময়ের বয়ান তুলে আনা ভিন্ন ধারার সাহিত্যকর্মের জন্য ২০১৫ সালে সভেতলানা আলেক্সিয়েভিচ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। Voices from Chernobyl বইটিতে বর্ণিত চেরনোবিল দুর্ঘটনার কিছু অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সর্বজনকথায় প্রকাশ করা হলো। অনুবাদ করেছেন মওদুদ রহমান।

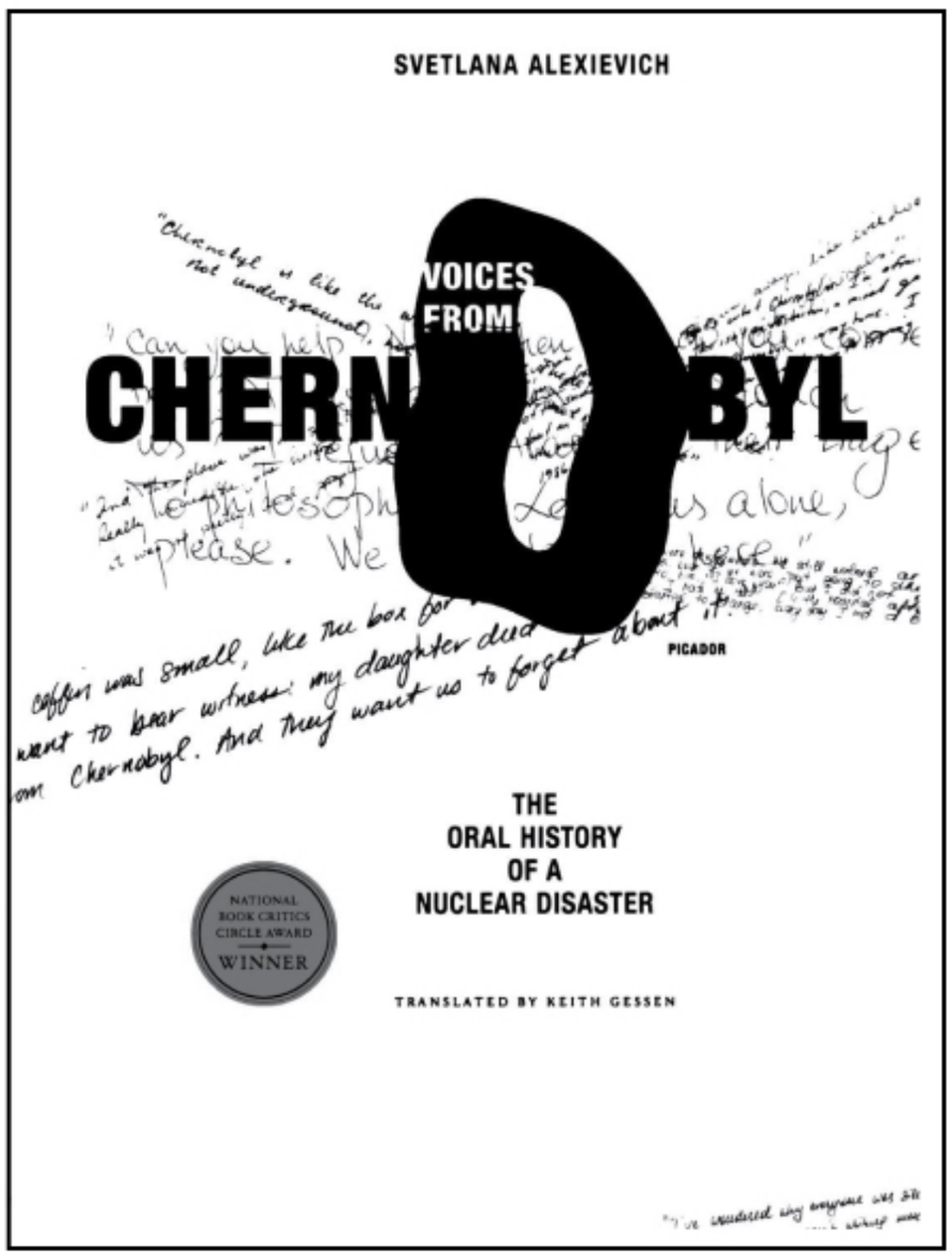

লারিসা
তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত সন্তানের মা

আমার মেয়ে সকলের চেয়ে অন্য রকম। প্রায় সময়ই ভাবি যে বড় হয়ে ও যদি প্রশ্ন করে–মা, আমি কেন সবার চেয়ে আলাদা? তখন আমি কী জবাব দেব!

ওর যখন জন্ম হলো, তখন ওকে দেখে মানবশিশু হিসেবে বোঝার কোনো উপায় ছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন সব দিক সেলাই করে রাখা ছোটখাটো ফোলা একটা বস্তা। দুটি চোখ ছাড়া ওর মধ্যে মানব শরীরের আর কোনো চিহ্ন ছিল না। বেডে ঝুলিয়ে রাখা মেডিক্যাল কার্ডে ডাক্তার ওর বর্ণনা লিখেছিল এইভাবে, 'একাধিক জন্মগত ত্রুটি নিয়ে ভূমিষ্ঠ কন্যাশিশু। পায়ুপথ অসম্পূর্ণ, যোনি অসম্পূর্ণ, বাম কিডনি অপরিপক্ব।' সেটা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষা। সাধারণ ভাষায় ওর শরীরে প্রস্রাব-পায়খানার কোনো রাস্তা ছিল না। কিডনি ছিল মাত্র একটা। জন্মের দ্বিতীয় দিনেই ওর শরীরে করা হলো প্রথম অপারেশন। প্রথমবার চোখ মেলার পর ভাবলাম, বুঝি কান্নার আওয়াজ পাব। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে ও হেসে উঠেছিল।

ওর মতো জন্ম নেয়া একটা শিশুও নাকি বাঁচেনি। জন্মের সাথে সাথেই সবাই মারা গেছে। কিন্তু ও বেঁচে ছিল। আমার ভালোবাসার শক্তি দিয়েই আমি ওকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

চার বছরে ওর শরীরে চারটি অপারেশন করা হলো। এমন শারীরিক জটিলতা নিয়েও যে বেঁচে থাকা যায়, তা ওকে না দেখলে বোঝা যাবে না। কিন্তু আমি ওকেই প্রচণ্ড ভালোবাসি। আমি নাকি আর কখনোই স্বাভাবিক বাচ্চার জন্ম দিতে পারব না। ডাক্তারদের বলতে শুনেছি যে অদ্ভুত আকার নিয়ে আমার মেয়ের জন্ম হয়েছে, তা যদি টেলিভিশনে দেখানো হতো তাহলে নাকি সবাই মা হবার আগ্রহ হারাত।

আমি চার্চে গেছি। সব কথা সেখানে খুলে বলেছি। প্রার্থনায় যোগ দিয়েছি। যাজক বলেছেন, এমনটা নাকি আমার পাপের কারণেই হয়েছে! কিন্তু আমার পরিবারের কেউই তো কোনো গুরুতর অপরাধ করেনি, কাউকে হত্যা করেনি। তাহলে আমি কার পাপের প্রায়শ্চিত্য করছি? দুর্ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ গ্রামের সবাইকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সরকারি কোষাগারে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় কর্তৃপক্ষ সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। এসব যখন চলছিল, তখনই আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে এখানে এখন আর ভালোবাসা যায় না, সুস্থ সন্তান জন্ম দেয়া যায় না। অনেক বছর আগে যখন আমার দাদি বাইবেল পড়ে শোনাত তখন শুনেছিলাম, এমন একটা সময় নাকি আসবে, যখন ফুল-ফল-খাবারের কোনো কমতি থাকবে না; কিন্তু মানুষ তখন নিজের উত্তরসূরি উৎপাদনের ক্ষমতা হারাবে। আমি এগুলো রূপকথা হিসেবেই শুনতাম। কখনোই বিশ্বাস করতাম না।

এখন আমি আমার সন্তানের অবস্থা সবাইকে জানাতে চাই। আপনি সবকিছু লিখে নিন। সবাইকে জানিয়ে দিন। ওর বয়স এখন চার। সে গান গায়, নাচে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। মানসিক পরিপক্বতার দিক থেকে বাকি সব বাচ্চার সাথে ওর কোনো পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র ওর চারপাশের জগৎটা ভিন্ন রকম। বাকি সবার মতো ও 'স্কুল স্কুল' খেলে না। ওর খেলার জগৎ হাসপাতালকে ঘিরেই। ও পুতুলকে টিকা দেয়, জ্বর মাপে, বেডে শুইয়ে দেয়। আর মরে গেলে সাদা চাদরে ঢেকে দেয়। জন্মের পর থেকেই ওকে নিয়ে আমরা হাসপাতালে আছি। তাই হাসপাতালকেই ওর কাছে বাড়ি মনে হয়।

শরীর সামান্য ভালো হলে ওকে নিয়ে যখন বাড়িতে যাই, তখন ও হাসপাতালে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ডাক্তাররা অপারেশন করে ওর একটা কৃত্রিম পায়ুপথ তৈরি করেছে। সেই সাথে একটা যোনিপথও তৈরি করা হয়েছে। শেষ অপারেশনটার পর ওর প্রস্রাবপ্রণালী সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। কোনো কিছুতেই আর কাজ হচ্ছিল না। ডাক্তাররা জানাল যে আরও অপারেশন দরকার। কিন্তু সেগুলো এখানে করা সম্ভব নয়। তারা আমাকে বিদেশের হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলল। কিন্তু আমার স্বামীর মাসিক আয় মাত্র ১২০ ডলার। বিদেশে নিয়ে যাওয়ার হাজার হাজার ডলারের খরচ আমরা কোথা থেকে জোগাড় করব! আমাদের দুরবস্থা দেখে এক অধ্যাপক একান্তে ডেকে নিয়ে জানালেন যে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত আমার মেয়ের এমন জীবন্ত শরীর নাকি চিকিৎসাবিজ্ঞানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর ব্যাপারে তাই বিস্তারিত জানিয়ে তিনি আমাকে বিদেশি হাসপাতাল গুলোতে যোগাযোগ শুরু করতে বললেন। এখন আমি সেটাই করছি। বিদেশি হাসপাতালগুলোতে একের পর এক চিঠি পাঠাচ্ছি। লিখছি যে আমাদের এমন একটি সন্তান আছে, যাকে আধা ঘণ্টা পর পর চেপে ধরে শরীর থেকে প্রস্রাব বের করিয়ে দিতে হয়! পৃথিবীতে আর এমন একটা শরীরও কি আছে, যার ওপর এমন কষ্ট দেয়া হয়! তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত শরীরে কী হতে পারে সেটা আমার মেয়েকে না দেখিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি আমার মেয়েকে এখন যে কোনো জায়গায় দিয়ে দিতে মানসিকভাবে তৈরি আছি–এমনকি তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হলেও। কিন্তু এর পরও আমি ওকে মরে যেতে দিতে চাই না। ও বেঁচে থাকুক–এমনকি ল্যাবরেটরির ব্যাঙ কিংবা খরগোশের মতো জীবন ধারণ করে হলেও!

ওর এখনও কিছু বুঝে ওঠার বয়স হয়নি। কিন্তু একদিন হয়তোবা ও আমাদের প্রশ্ন করবে, 'আমি কেন বাকি সবার মতো নই? আমার কেন কাউকে ভালোবাসার অধিকার নেই? পাখি-প্রজাপতির যে স্বাধীনতা আছে, আমার তা নেই কেন?' আমার এই প্রশ্নের জবাব নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। আমাদের তো প্রমাণ করার দায় আছে যে ওর এই অবস্থার পেছনে বাবা-মা হিসেবে আমরা দায়ী নই। আমরা ভালোবেসে ওকে জন্ম দিয়ে কোনো ভুল করিনি। চার বছর ধরেই আমি তাই কাগজপত্র, সার্টিফিকেট জোগাড় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তারদের কাছে গেছি। আমলাদের অফিসে ধরনা দিয়েছি। প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তিদের সাথে দেখা করে কথা বলার চেষ্টা করেছি। চার বছর পর অবশেষে ডাক্তাররা আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছে যে আমার মেয়ের এই অবস্থার কারণ হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তা। কিন্তু এই ক'বছর ধরে সবাই এই সত্যটা অস্বীকার করে আসছিল। বলছিল যে আমার মেয়ে নাকি প্রতিবন্ধিত্বের শিকার! কিন্তু আমি শুরু থেকেই জানতাম যে আমার মেয়ে আসলে চেরনোবিল দুর্ঘটনার শিকার। আমার পরিবারের কারোরই শারীরিক অস্বাভাবিকতা ছিল না। পূর্বপুরুষদের সকলেই আশি কিংবা নব্বই বছর পর্যন্ত বয়স পেয়েছে। আমার দাদা মারা গেছে চুরানব্বই বছর বয়সে। ডাক্তাররা আমাকে জানিয়েছিল যে এই ধরনের শারীরিক অসুস্থতাকে সাধারণ অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে। বিশ-ত্রিশ বছরের আগে নাকি এই দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। কিন্তু আমি তো এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে পারব না। আমি ওদের সবাইকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাই। আমি সরকারেরও বিচার চাই। ওরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। এক সরকারি কর্মকর্তা আমাকে এমনও বলেছে যে আমি নাকি ফান্ডের অর্থ পাওয়ার লোভে এমন করছি!

তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত শরীরে কী হতে পারে সেটা আমার মেয়েকে না দেখিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি আমার মেয়েকে এখন যে কোনো জায়গায় দিয়ে দিতে মানসিকভাবে তৈরি আছি–এমনকি তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হলেও। কিন্তু এর পরও আমি ওকে মরে যেতে দিতে চাই না। ও বেঁচে থাকুক–এমনকি ল্যাবরেটরির ব্যাঙ কিংবা খরগোশের মতো জীবন ধারণ করে হলেও!

আমার মেয়েটা দিনে দিনে বড় হচ্ছে। এখন কোনো গর্ভবতী মহিলা দেখলেই আমার ভেতরে হাহাকার জেগে ওঠে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। কেমন যেন এক মিশ্র অনুভূতি আমাকে গ্রাস করে নেয়। আমি চমকে উঠি, ভয় পাই, আবার হিংসাও লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় উল্টোপাল্টা কিছু করে প্রতিশোধ নিই।

ভ্যালেন্টিন বরিসেভিচ
সাবেক ল্যাবরেটরি প্রধান, ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এনার্জি
বেলারুশ একাডেমি অব সায়েন্স

অনেক আগে থেকেই আমার লেখালেখির অভ্যাস ছিল। মনে আছে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর আশপাশে যা ঘটেছিল, যে যা কিছু বলছিল, সবকিছু লিখে রেখেছিলাম। তেমনিভাবে চেরনোবিল দুর্ঘটনার প্রথম দিন থেকেই সবকিছুর বর্ণনা আমার ডায়েরিতে টুকে রাখা আছে। আমি জানতাম যে সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুই ভুলে যাব অথবা স্মৃতি থেকে হারিয়ে ফেলব। আমার নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী বন্ধুরা সে সময় ছিল সবকিছুর কেন্দ্রে। কিন্তু এখন জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে যে তারা তখনকার দিনের সবটুকু অভিজ্ঞতা মনে করতে পারছে না। কিন্তু আমি সবকিছু লিখে রেখেছি।

তখন আমি বেলারুশ সায়েন্স একাডেমির ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এনার্জিতে কাজ করতাম। প্রতিদিনকার মতো ওই ঘটনার দিনও ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলাম। আমি ছিলাম ইনস্টিটিউট ল্যাবরেটরির প্রধান। শহরের বাইরে একটা জঙ্গলের পাশে ছিল আমাদের ইনস্টিটিউট। ওই দিনের আবহাওয়া ছিল চমৎকার। অফিসের জানালা খোলা ছিল। বসন্তের চমৎকার হাওয়া চারদিকে খেলা করছিল। কিন্তু জানালার পাশে ঝুলিয়ে রাখা খাবারের পাত্রটাকে ঘিরে প্রতিদিনকার মতো জড়ো হওয়া পাখিগুলো না দেখে একটু অবাকই হলাম। ভাবলাম হয়তো আরও ভালো কোনো আশ্রয়ের খোঁজ পেয়ে চলে গেছে। এরই মাঝে খবর পেলাম যে ইনস্টিটিউটের তেজস্ক্রিয়তা মাপার ডোসিমিটারগুলো হঠাৎ করেই বেশি রিডিং দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দুইশ গুণ বেশি এই উচ্চমান দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। বাতাসে তখন প্রতি ঘণ্টায় তিন মিলিরন্টজেন করে তেজস্ক্রিয়তা ছড়াচ্ছিল। বিষয়টা ছিল খুবই উদ্বেগজনক। কেননা এই তেজস্ক্রিয় মাত্রায় বিশেষ পরিস্থিতিতে ছয় ঘণ্টার বেশি কাজ চালিয়ে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। প্রথমে মনে করা হলো যে তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্র ফেটে যাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল সেগুলো ঠিকই আছে। পরে সবাই ভাবল যে ল্যাবে রাসায়নিক নিয়ে আসার সময় দুর্ঘটনাবশত এই তেজস্ক্রিয়তা চারপাশে ছড়িয়েছে। কিন্তু চেষ্টা

করেও উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল না। ওই সময় আভ্যন্তরীণ রেডিওতে কাউকে বিল্ডিং ছেড়ে বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মুহূর্তেই যে যার রুমে ঢুকে পড়ল। চারপাশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হলো।

ডোসিমিটার দিয়ে যেখানেই পরীক্ষা করা হচ্ছিল, সেখানেই তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতি ধরা পড়ছিল। অফিসের টেবিল, আমার পোশাক, ল্যাবরেটরির দেয়াল–সব জায়গাই যেন তেজস্ক্রিয়তায় জ্বলজ্বল করছিল। আমি বাথরুমে ঢুকে চুল ধুয়ে এলাম। ডোসিমিটার দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম যে এখন মাত্রা কিছুটা কমেছে। চিন্তা করতে লাগলাম কী কারণে এমনটা হতে পারে! বারবারই মনে হতে লাগল যে ইনস্টিটিউটের ভেতরের কোনো কিছু থেকেই এটা ছড়িয়েছে। সবকিছুতেই এখন তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাচ্ছে। আমি আমাদের রিঅ্যাক্টরগুলোর মান নিয়ে গর্বিত ছিলাম। এর প্রতিটি ইঞ্চি আমার নখদর্পণে ছিল। তাই এখন সবকিছু কিভাবে দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলা যায় তা নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিলাম।

সবকিছুতেই এখন তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যাচ্ছে। আমি আমাদের রিঅ্যাক্টরগুলোর মান নিয়ে গর্বিত ছিলাম। এর প্রতিটি ইঞ্চি আমার নখদর্পণে ছিল।

আমরা কাছেই থাকা ইগনালিস্ক পারমাণবিক কেন্দ্রে ফোন করলাম। সেখান থেকেও একই খবর পেলাম। হঠাৎ করেই তাদের যন্ত্রগুলোও নাকি উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার জানান দিচ্ছে। এরপর ফোন দিলাম চেরনোবিলে। কিন্তু সেখানে কেউ ফোন ধরল না। দুপুর গড়াতে গড়াতে পুরো মিনস্কের আকাশেই তেজস্ক্রিয়তার মেঘ ছেয়ে আছে বলে জানা গেল। এর ধরন দেখে বোঝার আর বাকি রইল না যে চুল্লিতেই কিছু একটা হয়েছে।

প্রথমেই আমার স্ত্রীকে ফোন করে জানানোর কথা মনে হলো। কিন্তু আমার ইনস্টিটিউটের সবগুলো ফোনে আড়ি পাতা থাকে। এটা ছিল ওপেন সিক্রেট একটা ব্যাপার। কিভাবে বাড়ির সবাইকে সতর্ক করা যায় তা কিছুতেই মাথায় আসছিল না। আমার মেয়েটা হয়তো তখন বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলছে, কিংবা আইসক্রিম কিনে খাচ্ছে। ভাবতে পারছিলাম না কী করব। ফোন করে জানানোর কথাই বারবার মনে হতে লাগল। কিন্তু এটা করলে ভবিষ্যতে আমাকে স্পর্শকাতর আর কোনো প্রজেক্টেই কাজ করতে দেয়া হবে না। কিন্তু শেষে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। রিসিভার তুলে নিয়ে বাসার নাম্বারে ডায়াল করা শুরু করলাম।

ওপাশ থেকে ফোন তুলতেই চুপচাপ আমার কথা শুনে যেতে বললাম। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। আমি তাকে আবারও জোরে কথা বলতে নিষেধ করলাম। বললাম, 'সবগুলো জানালা বন্ধ করে দাও। খাবারগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখো। হাতে গ্লাভস পরে ভেজা কাপড় দিয়ে সবকিছু মুছে ফেলো। বাইরে যদি ধোয়া জামাকাপড় শুকাতে দেয়া থাকে তাহলে সেগুলো আবার ধুতে রেখে দাও।' কিন্তু ফোনের ওপাশ থেকে আবারও জানাল যে কিছুই নাকি বোঝা যাচ্ছে না। আমি কথা বলতেই থাকলাম। বললাম দুই ফোঁটা আয়োডিন পানিতে মিশিয়ে সেই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিতে। ও কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি এবার ফোনটা রেখে দিলাম। আমার স্ত্রীও এই ইনস্টিটিউটের কাজের সাথে জড়িত। যা বললাম তাতে ও সবকিছু বুঝে নেবে বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে চেরনোবিল দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রথম জানতে পারলাম। ওই সন্ধ্যায় বাসে করে আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত আমরা ভয় পাচ্ছিলাম।

বাড়ি ফিরে পরনের সবকিছু খুলে ফেললাম। হঠাৎ করেই রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলাম না। যা হবার হবে ভেবে ফোন ডিরেক্টরি নিয়ে বসলাম। পরিচিত সকলের নাম্বারে ফোন করা শুরু করলাম। ইনস্টিটিউটে কাজ করার সুবাদে বিষয়টা বোঝানো আমার জন্য সহজ ছিল। সবাইকে দুর্ঘটনার কথা জানালাম। এই মুহূর্তে কী করা উচিত তা উল্লেখ করলাম। সবার চুল ধুয়ে নিতে বললাম। জানালা বন্ধ করে ভেতরে থাকতে বললাম। সাথে সাথে পানিতে আয়োডিন মিশিয়ে খাওয়ার নিয়মটাও শিখিয়ে দিলাম। কথা শেষে নিয়মমাফিক ধন্যবাদ দিয়েই সবাই ফোন নামিয়ে রাখছিল। কেউ কোনো প্রশ্ন করছিল না। কারো কণ্ঠে কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ করলাম না। মনে হচ্ছিল, হয় তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি, নয়তো ঘটনার ভয়াবহতার বিষয়টা আমি তাদের বোঝাতে পারিনি।

কিছুক্ষণ পর এক বন্ধুর ফোনকল এলো। সে-ও ছিল পরমাণু বিজ্ঞানী। আশ্চর্যজনকভাবে ওর মধ্যে কেমন যেন একটা নির্ভার ভাব টের পেলাম। পুরো ব্যবস্থাটার ওপর বিশ্বাস আমাদেরকে সে সময় অন্ধ করে রেখেছিল। অবচেতনার বশে কেউই সে সময় ভয়াবহতা আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। ফোনে সে তখন পরের মাসে ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আমাকে জানাতে লাগল। বলল যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ও এবার গোমেল যাবে। চেরনোবিলের পাশের শহরই গোমেল। আমি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ!'

আমরা কেউই চেরনোবিল ভুলে যাইনি। সত্যি বলতে কি, আমরা এখনও এটাকে বুঝেই উঠতে পারিনি।

অ্যাটম বোমা নিয়ে আন্দ্রেই সাখারভের সাথে আলাপচারিতার কিছু অংশের বর্ণনা আদামোভিচ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। হাইড্রোজেন বোমার জনক হিসেবে পরিচিত সাখারভ বলেছিলেন, 'তুমি কি জানো, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরমুহূর্তেই বাতাসে অন্য রকমের এক সুবাস ছড়ায়?' ওই কথায় রোমান্টিসিজম ছিল। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে বাস্তবে যা ছড়ায় তা ভয়ংকর। প্রথম অ্যাটম বোমা যখন ১৯৪৫ সালে ব্যবহার করা হয়, তখন আমার বয়স ছিল সতেরো বছর। আমি সায়েন্স ফিকশন ভালোবাসতাম। পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও ছুটে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, পরমাণুতে লুকিয়ে থাকা শক্তি দিয়েই হয়তো মহাকাশে দাপিয়ে বেড়ানো সম্ভব হবে। এই স্বপ্ন নিয়ে বেড়ে উঠতে উঠতেই ভর্তি হলাম মস্কো এনার্জি ইনস্টিটিউটে। সে সময় পরমাণু শক্তি বিভাগকে স্পর্শকাতর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে পরমাণু বিজ্ঞানীরা সমাজের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় ছিল। সকলেই তাদের সম্মান করত। তারা ছিল সেরাদের সেরা। তখন বিজ্ঞানে মানবতার কোনো জায়গা ছিল না। আমাদের শেখানো হতো যে মাত্র তিনটি মুদ্রায় সঞ্চিত শক্তি দিয়েই একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো যায়। শুনে মাথা ঘুরিয়ে যাওয়ার দশা

মানুষ বিজ্ঞান ব্যবহার করে জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু স্বৈরাচারীরা বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে জীবনকে কেবলই দুর্বিষহ করে তোলে।

হতো! সেই সময়টা ছিল গোপনীয়তার যুগ। আমরা আমেরিকানদের থেকে লুকাতাম, আর আমেরিকানরা আমাদের কাছ থেকে। এই কাজের সাথে জড়িত সকলেই উচ্চ বেতন পেত। গোপনীয়তা তাদের কাজে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করত। তখন চারপাশে এক প্রকার বিজ্ঞানপূজাই চলছিল! এ কারণে চেরনোবিল দুর্ঘটনার বহুদিন পরও এটিকে স্বীকার করে নেয়াটা কষ্টকর ছিল। কিন্তু সেই বিশ্বাসী বিজ্ঞানের যুগ চেরনোবিল দুর্ঘটনার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায়।

সময় পাল্টেছে। এখনকার প্রজন্ম অন্য ধাঁচে বেড়ে উঠছে। কিন্তু আমাদের কালে ভিন্ন কিছু চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হতো না। মানুষ সব সময়ই সবকিছুর উর্ধ্বে উঠতে চায়, সবকিছু আয়ত্ত্বে নিতে চায়। পশ্চিমা সাহিত্যে পরাবাস্তব পৃথিবীর পারমাণবিক দুর্যোগের কথা বহু আগেই এসেছে। ওই কল্পকাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের এখানে এখন বাস্তব।

একটু গভীরভাবে তাকালেই বোঝা যায় যে পরমাণু কর্মসূচি এখানে শুধু একটি অভিশাপ আর সামরিক গোপনীয়তার বিষয়ই ছিল না; বরং এটাই ছিল আমাদের ধ্যানজ্ঞান, আমাদের ধর্ম। কিন্তু পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানেই সবকিছু ভেঙে গেছে। আমার কাছে মনে হয়, আমরা বিজ্ঞান দিয়ে চালিত হইনি, বরং অন্য কোনো কিছু আমাদের চালিয়ে নিয়েছে!

আমি একসময় পদার্থবিজ্ঞান ভালোবাসতাম। এটি ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমি আমার মোহভঙ্গের কারণ নিয়ে লিখতে চাই। সবাইকে জানাতে চাই যে বিজ্ঞান আসলে কতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে। মানুষ বিজ্ঞান ব্যবহার করে জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু স্বৈরাচারীরা বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে জীবনকে কেবলই দুর্বিষহ করে তোলে।

আমাদের শরীরে তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতি নিয়ে আমরা অনেক পরে চিন্তা করতে শুরু করি। তখন প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেছে। ওই সময়টায় একে একে পরিচিত অনেকেই অসুস্থ হতে শুরু করে। কেউ মারা যায়, কেউ পাগলের মতো আচরণ শুরু করে, কেউ আত্মহত্যা করে। তখন আমাদের সকলের হুঁশ ফিরে আসে।

পরিচয় প্রকাশ করতে না চাওয়া সৈনিক
দুর্ঘটনাস্থল নিরাপদকরণ দলের সদস্য

আমি একজন সৈনিক। আমাকে যা নির্দেশ দেয়া হবে, আমি সেটাই করতে বাধ্য। কিন্তু আমার মাঝে তখন ছিল নায়ক হিসেবে পরিচিত হওয়ার বাসনা। রাজনীতিবিদরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে সে সময় তা উস্কে দিয়েছিল। রেডিও-টেলিভিশনেও সারাক্ষণ একই প্রচার চলছিল। কেউ তখন দুর্ঘটনাস্থলে কাজ করাটাকে টেলিভিশনের পর্দায় নিজেকে হাজির করার উপায় হিসেবে মনে করছিল, কেউ মনে করছিল এটা বীরোচিত কাজ, আর কেউ কেউ এটাকে নির্দেশ হিসেবে মেনে কাজ করতে চলে এসেছিল। আমাদের ভালো বেতন দেয়া হচ্ছিল। কিন্তু কেউই আমরা এটা নিয়ে ভাবতাম না। আমার বেতন ছিল চারশ রুবল। আমি সেখানে যাওয়ার পর এক হাজার রুবল করে পেতে শুরু করলাম। মানুষ পরে বলাবলি করত যে সৈনিকরা সেখানে নাকি টাকার লোভেই গেছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে কেউ প্রথমবারের মতো গাড়ি কিনছে, কেউ ফার্নিচার কিনছে। এই ধরনের প্রচারে আমার খুব লাগত। কারণ বীর হিসেবে সম্মানের দিকটা এইসব প্রচারে চাপা পড়ে যেত।

আমি সেখানে যাওয়ার আগে কিছু মুহূর্তের জন্য হলেও ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর আমার সকল ভয় উবে গেল। সেখানে আমাদের জন্য নির্দেশ আর কাজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। হেলিকপ্টারে চেপে রি-অ্যাক্টরটা ওপর থেকে আমার দেখার ইচ্ছা ছিল। আমি বুঝতে চাইছিলাম যে আসলে কী হয়েছে। কিন্তু সেটা ছিল নিষিদ্ধ। আমার মেডিক্যাল কার্ডে লেখা আছে যে ওই সময়ে আমার শরীরে মোট ২১ রন্টজেন বিকিরণ এসেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে এই হিসাব কতটা সঠিক। এই তেজস্ক্রিয়তা সেখানে এক উদ্ভট উপায়ে মাপা হতো। দুর্ঘটনাস্থলের ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে ডোসিমিটার নিয়ে একজন তেজস্ক্রিয়তা মাপার দায়িত্বে ছিল। সেখানে আমাদের শরীরের তেজস্ক্রিয়তার রিডিং নেয়া হতো। পরে সেটাকে আমাদের কর্মঘণ্টা দিয়ে গুণ করে মোট তেজস্ক্রিয়তার রেকর্ড লেখা হতো। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলে রি-অ্যাক্টরের পাশে কাজ করার সময় কখনও কখনও সেখানে ৮০ রন্টজেন তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যেত, কখনও বা ১২০। কখনও কখনও হেলিকপ্টার নিয়ে রি-অ্যাক্টরের চারপাশে চক্কর দিয়ে আমাদেরকে ছবি তুলে আনতে বলা হতো। এই কাজটা আমরা রাতের বেলায় করতাম। ইনফ্রারেড ক্যামেরা দিয়ে যখন নিচে তাকাতাম, তখন চারপাশে জ্বলজ্বলে তেজস্ক্রিয়তার উপস্থিতি দেখতাম, যা দিনের বেলায় সাধারণ চোখে বোঝার উপায় ছিল না।

আমি সেখানে যাওয়া বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলেছিলাম। একজন অভয় দিয়ে বলেছিল যে আমার হেলিকপ্টার এতটাই নিরাপদ যে সেটা নাকি জিহ্বায় চেটে নেয়া সম্ভব! আরেকজন শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আপনারা রি-অ্যাক্টরের পাশে যাওয়ার সময় বিশেষ স্যুট ব্যবহার করেন না কেন? আপনারা কি আর বেঁচে থাকতে চান না?' আমরা আমাদের সিটগুলোর নিচে সিসার আস্তরণ দিয়ে নিয়েছিলাম, সিসার বিশেষ দেহবর্মও পরে নিতাম। কিন্তু পরে জানা গেল, সেটা নাকি মাত্র এক ধরনের বিকিরণ থেকে রক্ষা করতে পারে, অন্য বিকিরণ নাকি নির্দ্বিধায় সিসা ভেদ করতে পারে। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করতাম। আর রাতে ক্লান্ত হয়ে টিভি দেখতাম। তখন বিশ্বকাপ ফুটবল চলছিল। কাজের বাইরে আমরা শুধু ফুটবল নিয়েই কথা বলতাম।

আমাদের শরীরে তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতি নিয়ে আমরা অনেক পরে চিন্তা করতে শুরু করি। তখন প্রায় তিন বছর পেরিয়ে গেছে। ওই সময়টায় একে একে পরিচিত অনেকেই অসুস্থ হতে শুরু করে। কেউ মারা যায়, কেউ পাগলের মতো আচরণ শুরু করে, কেউ আত্মহত্যা করে। তখন আমাদের সকলের হুঁশ ফিরে আসে। কিন্তু এর আসল প্রভাব বুঝতে নাকি আরও বিশ-ত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আমি আমার মা-বাবার কাছ থেকে চেরনোবিল মিশনে আমার কাজের বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। কিন্তু কোনো এক পত্রিকায় আমার ছবিসহ সংবাদ দেখে আমার ভাই সকলকে জানিয়ে দেয়। এর পর থেকে সকলের মাঝে সে তার ভাইয়ের বীরত্ব প্রচার করতে শুরু করে। কিন্তু সেদিন থেকে আরো একটি কান্নাও শুরু হয়–আমার মায়ের কান্না।